IJDD ISSN : 3006-449X INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 3 No. 1, June, 2026

The Education System in the Age of Rasulullah (Sm): An Evaluation

[রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা]

Dr. Reazul Islam[1], Monirul Islam[2*]

[1]Lecturer, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

[2]Lecturer, PhD Fellow, Department of Dawa & Islamic Studies, Islamic University, Kushtia-7003, Bangladesh.

Corresponding Author: *Monirul Islam, prof.monir21@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Keywords: ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, দারুল আরকাম, মসজিদে নববী, আসহাবে সুফফা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি।

Received: 14.03.2026
Revised: 17.06.2026
Accepted: 25.06.2026

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

CC BY

A B S T R A C T

The educational system during the era of Prophet Muhammad (SAW) stands as a revolutionary chapter in human civilization. From the very beginning of prophethood, the command "Iqra" established knowledge as the foundation of Islamic civilization. In the Makkan period, Darul Arqam, the house of Fatimah bint al-Khattab, and the home of Abu Bakr (RA) emerged as significant—though secret—centers of learning. After the Hijrah, Madinah became the nucleus of organized Islamic education: Masjid al-Nabawi functioned as the central institution, while Ashab al-Suffah formed the first residential school in Islam. The system of educating children through war captives and the introduction of educational supervision under state authority added new dimensions to the learning structure. The Prophet's (SAW) emphasis on women's learning through dedicated sessions further reflected his visionary approach. Thus, from Makkah to Madinah, an integrated, ethical, and human-centered educational system was established, laying the foundation for the flourishing of Islamic civilization.

ভূমিকা

ইসলামের আবির্ভাব মানুষের জ্ঞানচেতনা, আচার-আচরণ ও সভ্যতাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। নবুওয়তের সূচনা থেকেই জ্ঞানের প্রতি আহ্বান ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। "ইক্‌রা" শব্দটি দিয়ে আল্লাহ তাআলা যে মহান শিক্ষা-দর্শনের সূচনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার বাস্তব রূপদাতা হিসেবে মানবসমাজকে একটি শিক্ষিত, সচেতন ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করার অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, দাওয়াহর নরম শক্তি এবং শিক্ষানুমুখ সংস্কার সেই যুগের আরব সমাজকে অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞানে, আত্মিকতায় ও নৈতিক শক্তিতে বিশ্বমানের উন্নত সমাজে রূপান্তরিত করে। মক্কা যুগে গোপন শিক্ষাকেন্দ্র–যেমন দারুল আরকাম, বাইতে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব–ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলে। আবু বকর (রা.)-এর ঘর ছিল তিলাওয়াত ও দাওয়াহর এক অনন্য কেন্দ্র। প্রতিকূল পরিবেশেও এসব শিক্ষাকেন্দ্র সাহাবিদের চরিত্রগঠন, কুরআন-চিন্তা ও তাওহিদের বোধকে গভীরতর করে তোলে। হিজরতের পর মদীনায় শিক্ষা নতুন মাত্রা লাভ করে; মসজিদে নববী হয় কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষার কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা, আর আসহাবে সুফফা গড়ে ওঠে ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। যুদ্ধবন্দীদের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা পরিদর্শন প্রবর্তন ছিল সেই সময়ের রাষ্ট্র-সমর্থিত শিক্ষাব্যবস্থার অনন্য উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) নারী শিক্ষার গুরুত্বও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন; নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাসভা আয়োজন তাঁর শিক্ষা-নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক–সব ক্ষেত্রেই সুসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে, যা পরবর্তীতে ইসলামী সভ্যতার বিকাশে মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রবন্ধে উক্ত যুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ (مُحَمد)। কুর'আনে এ নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] নবী (সা.)-এর মা আমেনা তাঁর নাম রাখলেন আহমাদ।[২] হাদীসের বর্ণনায় রাসূল (সা.)-এর অনেক নাম পরিলক্ষিত হয়।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) 'আমুল ফীল' বা হস্তীবাহিনীর বছর রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে সোমবার কুরাইশ বংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] মুহাম্মদ (সা.) 'আরবী এবং আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে বুখারী রহ. বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্দ মানাফ ইব্‌ন কুসাই ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন নাদর ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খাযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা ইব্‌ন ইলিয়াছ ইব্‌ন মুদার ইব্‌ন নাযার ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আদনান।[৫] মায়ের দিক থেকে আমিনা বিন্‌ত ওয়াহাব ইব্‌ন 'আব্দুল মান্নাফ ইব্‌ন যুহরা ইব্‌ন কিলাব। এ ভাবে পৌত্রিক বংশের সাথে তাঁর মায়ের বংশতালিকা মিলে যায়।[৬]

মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের পূর্বেই পিতা 'আব্দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। তিনি ছয় বছর বয়সে মা আমিনার সাথে পিতার কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় রওয়ানা হন। কিন্তু মদীনা থেকে মক্কায় ফিরার পথে আবওয়া নামক (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) স্থানে তাঁর মাতা আমিনা ইন্তিকাল করেন। এরপর পিতা-মাতা ইন্তিকাল করার কারণে মুহাম্মদ (সা.) উভয় দিক থেকে এতিম হন।[৭] মুহাম্মদ (সা.) মায়ের মৃত্যুর পর দাদার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।[৮] আট বছর বয়সে রাসূল (সা.) দাদাকে হারালে তাঁর

তত্ত্বাবধানের ভার চাচা আবূ তালিব নেন।[৯] মুহাম্মদ (সা.) প্রথম বিবাহ করেন উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা রা.কে বিবাহ করেন।[১০] এ ছাড়াও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তা'আলার ইশারায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১১] ইব্ন ইসহাক রহ. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মীনীদের ক্রমধারা বর্ণনা করেছেন এ ভাবে : খাদীজা, সাওদা, 'আয়েশা, হাফসা, যয়নাব বিন্ত খুযাইমা, উম্মু হাবীবা, উম্মু সালামা, যয়নাব বিন্ত জাহাশ, জুওয়াইরিয়া, সাফিয়া, মায়মূনাহ।[১২] রাসূল (সা.)-এর বয়স চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ঐশী বাণী তথা ওহী নাযিল শুরু হয়।[১৩] মদীনায় হিজরতের একবছর পূর্বে নবূওয়াতের দশম বর্ষে এ আলৌকিক মু'জিজা সংঘটিত হয়।[১৪] মুহাম্মদ (সা.) নবূওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা চেষ্টায় থাকতেন কীভাবে এ উম্মতদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াতের দিকে আনা যায়। এক পর্যায়ে মক্কার মুশরিকরা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে। এমনকি তারা আল্লাহর রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করে। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে রক্ষার জন্য তাঁকে স্বপ্নে হিজরতের নির্দেশ দিয়ে স্বপ্নে সে স্থানের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন। এক পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশে তিনি ও তাঁর প্রিয় সাহাবী আবূ বকর রা. মক্কা থেকে রাতের অন্ধকারে মদীনায় হিজরত করেন।[১৫] রাসূল (সা.)-এর যুদ্ধের সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলেও প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গাযওয়ার সংখ্যা ২৭ টি।[১৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন।[১৭]

ইসলামী শিক্ষার পরিচয়

ইসলামী শিক্ষা বলতে মূলত তাওহীদভিত্তিক শিক্ষাকে বোঝায়। এ শিক্ষার মূল উৎস দুটি; আল কুরআন ও আল হাদীস। এ দুটি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে, এরই নাম ইসলামী শিক্ষা।[১৮] ইসলামী শিক্ষা মূলত কুরআন ও হাদীসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এ দুটোর ভিত্তি হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ।[১৯] ইসলামী নীতিমালা, অনুশাসন ও বিধিবিধান মোতাবেক মানুষের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চরিত্র এবং মানসিক শক্তি বিকাশের প্রয়াস ইসলামী শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ দ্বারা দুনিয়ার জীবনে সাফল্য লাভের পাশাপাশি পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য পথ নির্দেশ করে। অন্য কথায় মানবীয় গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর সৎ বান্দা হিসেবে তৈরি করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যম, আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি, আত্মবিকাশ ও সুকোমল বৃত্তির পরিস্ফুটন ও জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের দিকদর্শন। বহু শতকব্যাপী অজ্ঞতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত মানবসমাজকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে এগিয়ে এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। মানবজাতিকে উন্নত ও সভ্য করার লক্ষ্যে ওহিভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে জীবন ও আলোর পতাকা উত্তোলনের প্রয়াসে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[২০] শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওহিভিত্তিক শিক্ষাই মানুষকে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও প্রগতির সন্ধান দিতে পারে এবং আদর্শবান, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যার উজ্জ্বল নমুনাও অনুপম দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবায়ে কিরাম।[২১] আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

শিক্ষার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের জ্ঞানচর্চা একটি মৌলিক নীতি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। নবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে শিক্ষা মানবিক উৎকর্ষ, নৈতিক উন্নয়ন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কুরআনের প্রথম প্রত্যাদেশেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশনা এসেছে: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[২২]" এ আয়াত শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানকে শুধু ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক, প্রশাসনিক ও সভ্যতাগত উন্নতির জন্যও অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেছেন।

হাদীস নববীতে জ্ঞানের গুরুত্ব বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয।"[২৩] এখানে "ফরয" শব্দটি শিক্ষার প্রতি ইসলামের বাধ্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। আরও এক হাদীসে তিনি বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করবেন।"[২৪] মদিনা সমাজে শিক্ষা বিস্তারে নবী (সা.)-এর কার্যক্রম ছিল বৈপ্লবিক। বন্দিদের মুক্তির বিপরীতে শিক্ষাদান পদ্ধতি, আহলে সুফফা প্রতিষ্ঠা, নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা–এসবই তাঁর শিক্ষানীতির প্রমাণ। এছাড়া রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক জীবনে শিক্ষার বিস্তারে তিনি শিক্ষকতার মর্যাদা উন্নীত করেন এবং দ্বীন প্রচারের ভিত্তি হিসেবে জ্ঞানকে অপরিহার্য করেন।[২৫]

সার্বিকভাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টিতে শিক্ষা মানবজীবনের উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, আত্মশুদ্ধি এবং উম্মাহ গঠনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর শিক্ষা-দর্শন আজও মানবসভ্যতার জন্য স্থায়ী আদর্শিক দিকনির্দেশনা।

বিশ্বমানবতার শিক্ষক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)

রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতির প্রতি আল্লাহর এক মহামহিম অনুগ্রহ, যিনি শুধু একটি নির্দিষ্ট জাতি বা ভূখণ্ডের শিক্ষক নন; বরং সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। কুরআনে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সূরা আল-বাকারা ২:১২৭–১২৯–এ ইবরাহিম (আ.) এবং ইসমাঈল (আ.)–এর দোয়ার মধ্যে এই শিক্ষকের আগমনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মাঝ থেকেই এক রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাঁদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাঁদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাঁদের আত্মাকে পবিত্র করবেন।"[২৬] এই আয়াত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চারটি বৈশ্বিক দায়িত্ব দিয়েছেন–আয়াত পাঠ, জ্ঞান প্রদান, হিকমত শিক্ষা এবং আত্মশুদ্ধি। এগুলো মানবসভ্যতা ও নৈতিকতার চিরন্তন ভিত্তি।

এরপর ২:১৫১ নং আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেন: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ "যেমন আমি তোমাদের মাঝে এক রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের ওপর আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।"[২৭] এখানে শিক্ষাদান ও নৈতিক উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয়েছে, যা বিশ্বমানবতার জন্য এক সার্বজনীন শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে সূরা আস-সাফে

(৬১:২) মানবতার শিক্ষক হিসেবে তাঁর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো?"[২৮] এই আয়াত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার মূলনীতি–কথা ও কাজের সামঞ্জস্যকে সামনে আনে। তিনি নিজেই সর্বপ্রথম নিজের উপর শিক্ষা বাস্তবায়ন করেছেন, তারপর উম্মাহকে আহ্বান করেছেন। ফলে তাঁর শিক্ষাদর্শন শুধুই তাত্ত্বিক নির্দেশনা নয়, বরং পালনীয় ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ।

সার্বিকভাবে, এসব আয়াত মানবজাতির সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন এক মহান শিক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করে, যিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির সমন্বিত শিক্ষা দিয়ে বিশ্বমানবতার উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করেছেন। তাই তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যার শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয় কোনো জাতি, ধর্ম কিংবা সময়ের গণ্ডিতে–বরং সর্বকালের সর্বজনের জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মক্কায় শিক্ষা বিস্তার

মক্কা মুকাররামায় ইসলামের জন্য বিরূপ পরিবেশ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন ভাবে কুরআন শিক্ষা অব্যাহত ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হজ্ব মওসুমে এবং সময় ও সুযোগ মত মানুষকে কুরআন শোনাতেন। 'হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এমন কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় ছিল না যেখানে অবস্থান করে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শেখা ও শেখানোর ধারা অব্যাহত রাখতে পারতেন। রাত-দিন সর্বক্ষণ বিভিন্ন চিন্তা এবং ঘটনার জট লেগেই থাকতো। সেই সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র সত্তাই ছিল চলমান শিক্ষাকেন্দ্র। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে কিছু সদস্য চুপিসারে কুরআনের শিক্ষা লাভ করতেন।[২৯]'

রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে খাদিজা (রা.) কে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। তারপর তাঁর পরিচালক যায়েদ ইবনে হারিসা, চাচাত ভাই আলী, বন্ধু আবু বকর (রা.) প্রমুখকে তাঁর প্রতি ওহিভিত্তিক সার্বজনীন শিক্ষা প্রদান করেন। প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন যার ফলে সাফা পর্বতের পাদদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্যতম কর্তব্য ছিল মুমিনদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। তবে হিজরতের পূর্বে নিরাপদে বসে নিশ্চিন্তে কুরআন শিক্ষাদানের স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ তখন নির্যাতন-নিপীড়ন অহরহই চলছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহচর্যই ছিল এ যুগের সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাকেন্দ্র। এ সময়ে সাহাবাগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে কুরআন শিক্ষা করতেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু বকর (রা.), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন এ যুগের শিক্ষক। মক্কায় প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উপস্থাপন করা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে যেগুলো ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠেছিল:

মসজিদে আবু বকর (রা.): ইসলামের প্রথম যুগের এক অনন্য তিলাওয়াত কেন্দ্র

ইসলামের প্রারম্ভিক মক্কী পর্বে যখন মুসলিমদের জীবন হয়ে উঠেছিল চরম দুর্বিষহ, তখন আবু বকর (রা.)-ও হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মক্কা থেকে বহু দূর "বারক আল-গিমাদ" এলাকায় পৌঁছালে আল-কারা গোত্রপ্রধান ইবনে আদ-দাগিনা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রশ্ন

করেন–"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" আবু বকর (রা.) উত্তর দিলেন, "আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে; আমি এমন স্থানে যেতে চাই যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার রবের ইবাদাত করতে পারি।" ইবনে দাগিনা তাঁর উত্তর শুনে বলেন যে, আবু বকরের মতো সদাচারী, দরিদ্রপোষক, অতিথিপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও মানবসেবায় নিবেদিত মানুষকে হিজরত করতে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তিনি তাঁকে আশ্রয়দানকারী হিসেবে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন এবং কুরাইশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর গুণাবলি তুলে ধরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। কুরাইশ নেতারা শর্ত রাখে যে, আবু বকর (রা.) যেন প্রকাশ্যে ইবাদাত বা জোরে কুরআন তিলাওয়াত না করেন, যাতে তাদের নারী-শিশুরা প্রভাবিত না হয়। প্রথমদিকে তিনি শর্ত মেনে চললেও পরে বাড়ির আঙ্গিনায় একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। তাঁর সুন্দর, হৃদয়স্পর্শী ও ক্রন্দনমাখা তিলাওয়াত মুশরিক নারী-শিশুদের আকৃষ্ট করত, তারা ভিড় করে তাঁর আচার-আকৃতি ও পাঠ শুনত। এতে কুরাইশ নেতারা আতঙ্কিত হয়ে ইবনে দাগিনাকে পুনরায় চাপ দেয়। ইবনে দাগিনা আবু বকর (রা.)-কে জানালে তিনি বিনয়ের সাথে বলেন, "আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি; আমি আল্লাহর নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট।"[৩১]

এই মসজিদে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী না থাকলেও একে বলা যায় মক্কার প্রথম কুরআন-তিলাওয়াত কেন্দ্র, যেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে বৈরী পরিবেশেও অবিশ্বাসীদের শিশু-কিশোররা প্রথমবার সশ্রদ্ধভাবে কুরআনের সুরেলা ধ্বনি শুনেছিল। এটি ইসলামের শিক্ষাবিস্তারের এক অভিনব, হৃদয়স্পর্শী অধ্যায়, যা তিলাওয়াতের শক্তি ও সত্যের আবেদনকে অমর করে রেখেছে।

বাইতে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব: ইসলামের প্রথম যুগের এক গোপন শিক্ষাকেন্দ্র

ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বোন, এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনে যায়দ (রা.) ইসলামের প্রথমদিকের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তারা নিজেদের ঘরকে ইসলামী শিক্ষার একটি গোপন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন, যেখানে খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) নিয়মিত আসতেন এবং তাঁদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। তাঁদের কাছে সূরা ত্বা-হার একটি লিখিত সহীফা ছিল, যা খাব্বাব (রা.) পাঠ করতেন ও ব্যাখ্যা করতেন। উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কঠোর বিরোধী ছিলেন। বোনের ইসলামে প্রবেশের কথা শুনে তিনি ক্রোধে তরবারি হাতে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছান এবং সেখানে খাব্বাব (রা.)-কে কুরআন পাঠরত অবস্থায় পান। এ দৃশ্য তাঁর অন্তরে পরিবর্তনের সূচনা করে–যা পরবর্তীতে উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। সীরাতকারদের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই খাব্বাব (রা.)-সহ দু'জন মুসলিমকে তাঁদের গৃহে নিয়মিত শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩২] ফলত, বাইতে ফাতিমা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়, যেখানে কুরআন শিক্ষা, ঈমান দৃঢ়করণ এবং মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে দাওয়াহের ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল।

দারুল আরকাম ও শিয়াবে আবু তালিব: ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের শিক্ষাকেন্দ্র

ইবনে আবিল আরকাম (রা.) ছিলেন প্রারম্ভিক মুসলিমদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি, যার বাড়িটি–সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। দারুল আরকাম নামে ইসলামের প্রথম সুসংগঠিত শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইমাম আবুল ওয়ালিদ আযরাকীর বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর

সাহাবিদের নিয়ে এখানে নিয়মিত সমবেত হতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং নবাগত মুসলিমদের ইসলামের মূল শিক্ষা প্রদান করতেন। নতুন মুসলিমদের সাধারণত স্বচ্ছল সাহাবিদের ঘরে পাঠানো হতো, যেখানে তাদের থাকার ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা হতো।[৩৩] দারুল আরকাম ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এখানেই উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিম সমাজে নতুন শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হয়, এবং পরবর্তীতে তারা প্রথমবার কাবায় প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করার সাহস পায়। আযরাকীর ভাষায়: يجتمع هو وأصحابه عند الأرقم بن أبي الأرقم، ويقرءهم القرآن ويعلمهم অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ দারুল আরকামে সমবেত হতেন এবং তিনি তাঁদেরকে কুরআন পড়াতেন ও দ্বীনের জ্ঞান শিখাতেন।[৩৪]

এছাড়া মক্কার কুরাইশদের অবরোধ চলাকালে শিয়াবে আবু তালিব-এ তিন বছর অবস্থান করেও রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের শিক্ষা দান চালিয়ে যান। সেখানে আবু তালিব পরিবারের বাইরেও অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কঠোর অবরোধ ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও নবী (সা.)-এর শিক্ষাদান কর্মকাণ্ড থেমে যায়নি; বরং তা ধৈর্য, ঈমান এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।[৩৫]

এ দুই কেন্দ্র–দারুল আরকাম এবং শিয়াবে আবু তালিব–প্রমাণ করে যে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে শিক্ষা, তিলাওয়াত ও দাওয়াহ ছিল নবী (সা.)-এর মিশনের মূল ভিত্তি।

মদীনায় শিক্ষা বিস্তার: ইসলামের প্রথম সংগঠিত শিক্ষা আন্দোলন

নবুওয়াতের দশম সালে হজ্ব মৌসুমে মদীনার খাজরাজ গোত্রের ছয়জন আনসার ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নিজ শহরে ফিরে যান। পরের বছর–নবুওয়াতের ১১তম বছরে–মদীনার আউস-খাজরাজের ১২ জন প্রতিনিধি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানান যে মদীনায় ইসলামের দাওয়াত দ্রুত বিস্তার লাভ করছে, তবে শিক্ষাদান ও কুরআনের বোধসম্পন্ন প্রচারের জন্য একজন মুমিন শিক্ষকের প্রয়োজন। তাঁদের অনুরোধে নবী (সা.) মুস'আব ইবনে উমায়র (রা.)-কে মদীনায় প্রেরণ করেন।[৩৬]

মুস'আব (রা.) ছিলেন প্রারম্ভিক ইসলামের অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মনোনীত প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক।[৩৭] তিনি আকাবার প্রথম বায়আতের সদস্যদের সঙ্গে মদীনায় আসওয়াদ ইবনে জুরারাহ (রা.)-এর গৃহে অবস্থান নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। এটি ছিল মদীনায় ইসলামের প্রথম সুসংগঠিত শিক্ষা কেন্দ্র। সে সময় আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না; তাই মুস'আব (রা.) প্রতিদিন আনসারদের ঘরে ঘরে গিয়ে কুরআনের আয়াত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। যেহেতু কুরআন তাদের মাতৃভাষা আরবি, তাই অর্থ ও বক্তব্য দ্রুত অনুধাবন করতে পারতেন এবং প্রতিদিনই ২-৩ জন করে ইসলাম গ্রহণ করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মদীনায় ইসলামের বোধ, কাঠামো ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়।[৩৮]

হিজরতের পর মদীনায় শিক্ষা বিস্তার আরও সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। মসজিদে নববী হয়ে ওঠে ইসলামের প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র। এখানে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে সরাসরি কুরআন শিক্ষা নিতেন এবং ওহি লিপিবদ্ধকারীদের মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হতো। ওহি লেখকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২ জন, যাদের মধ্যে মুআবিয়া (রা.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। নবী (সা.) প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গোত্রে কুরআন-শিক্ষক পাঠাতেন, যা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ভিত্তি স্থাপন করে।[৩৯]

মসজিদে বানী যুরাইক কেন্দ্র: মদীনার প্রথম কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মদীনার ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে মসজিদে বানী যুরাইক-কেই সর্বপ্রথম কুরআন তাআলিমের আনুষ্ঠানিক কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে এখানেই মদীনার প্রথম কুরআন শিক্ষা পর্ব শুরু হয়েছিল। এই কেন্দ্রের প্রথম মু'আল্লিম ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বানু যুরাইক শাখার প্রখ্যাত সাহাবি রাফি ইবনে মালিক যারকী (রা.)। তিনি আকাবার প্রথম বাইআতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাছে সে সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ সমগ্র কুরআন শিক্ষা ওহীরূপে তুলে দেন–যার মধ্যে সূরা ইউসুফও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪০]

রাফি ইবনে মালিক (রা.) ছিলেন তাঁর গোত্রের নকীব, সর্দার এবং মদীনার "কামিল ব্যক্তিবর্গের" একজন। সে সময় 'কামিল' বলা হতো এমন ব্যক্তিকে, যিনি পড়তে-লিখতে জানেন, অস্ত্রচালনায় দক্ষ এবং গোত্রীয় নেতৃত্বে পারদর্শী–এ তিন গুণ রাফি (রা.)-এর মধ্যে পূর্ণতা পেত। আকাবা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজের এলাকায় উঁচু স্থানে বসে কুরআন শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন এবং তাঁর দাওয়াত গোত্রে নৈতিক ও ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি করে। মদীনায় সর্বপ্রথম সূরা ইউসুফের তিলাওয়াত ও তাআলিম তিনিই প্রদান করেন।[৪১]

পরবর্তীতে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রকে ঘিরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়–যা পরিচিত হয় মসজিদে বানী যুরাইক নামে। এটি শহরের কেন্দ্রস্থলে, মসজিদে গামামার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমনের পর রাফি ইবনে মালিকের দাওয়াতি প্রচেষ্টা, শিক্ষাআন্দোলন ও উত্তম চরিত্র দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কেন্দ্রটির শিক্ষক ও অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের যুরাইক শাখার মুসলমানরা, যা মদীনায় ইসলামী জ্ঞানের প্রাথমিক বিস্তারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।[৪২]

মসজিদে কুবার শিক্ষাকেন্দ্র

মদীনার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কুবা পল্লীর মসজিদ ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। আকাবার বাইআতের পর মক্কার দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমরা পর্যায়ক্রমে হিজরত করে কুবার আশপাশে আসতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে মুহাজিরদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। নতুন পরিবেশে তাঁদের ঈমানি শক্তি ধরে রাখা এবং কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেখানে তালিমি পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান মু'আল্লিম ছিলেন সালিম মাওলা আবী হুযাইফা (রা.), যিনি সে সময়ের সর্বাধিক কুরআনজ্ঞানসম্পন্ন সাহাবীদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি মসজিদে কুবার মধ্যে সাহাবিদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, পাশাপাশি ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। সালিম (রা.)-এর নেতৃত্বে কুবা মসজিদ মুহাজিরদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, কুরআন অধ্যয়ন এবং ইসলামী চরিত্র গঠনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনা আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই শিক্ষাকর্ম অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে রাসূল (সা.) নিজেও কুবা মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং এর গুরুত্ব আরও সুদৃঢ় হয়। কুবা মসজিদের এই প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার ইসলামী সমাজ গঠনে ভিত্তিমূলক ভূমিকা পালন করে।[৪৩]

নাকী আল-খাদিমাত শিক্ষালয়

মদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে, হাররা বানী বায়াদার কাছে অবস্থিত নাকী আল-খাদিমাত ছিল ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। সবুজে আচ্ছাদিত উর্বর এলাকার

নামকরণ হয়েছিল সেখানে জন্মানো নরম ও সুন্দর ঘাস "খাদীমা" থেকে। পরবর্তী যুগে খেলাফতে উমর (রা.) এখানে ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্যে আরব ঘোড়ার চারণভূমি প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াকুত আল-হামাবীর ভাষায়: "نقي الخديمات هو الموضع الذي جعله عمر بن الخطاب مرعى لخيول المسلمين" "এ স্থানটি হলো যেখানে উমর ইবনুল খাত্তাব মুসলিমদের ঘোড়ার চারণভূমি বানান।"[৪৪]

এই শিক্ষালয় অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় বিস্তার, অবস্থান ও প্রভাবের দিক থেকে ছিল অধিকতর শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত। আকাবার বাইআতের সময় আনসারদের আওস ও খাযরাজ–দু'গোত্রের নেতারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে মদীনায় একজন মু'আল্লিম পাঠানোর অনুরোধ জানান। তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুস'আব ইবনে উমাইর (রা.)-কে কুরআন শিক্ষা ও দ্বীনি প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে মদীনায় পাঠান। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে: " فبعث رسول الله مصعب بن عمير معهم يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين" "রাসূলুল্লাহ তাঁদের সাথে মুস'আবকে পাঠালেন যাতে তিনি কুরআন শিক্ষা দেন এবং দ্বীনের বিধি-বিধান শেখান।"[৪৫]

মুস'আব (রা.) আস'আদ ইবনে যুরারার (রা.) বাড়িতে অবস্থান করে নাকী আল-খাদিমাতে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তৃত কার্যক্রম শুরু করেন এবং "মুকরী" (অর্থাৎ কুরআন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক) হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বারা ইবনে আযিব (রা.) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)–যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) আগমনের আগেই বহু সূরা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। যায়েদ (রা.) বলেন: "حفظت سبع عشرة سورة قبل قدوم رسول الله المدينة" "রাসূলুল্লাহ মদীনায় আগমনের পূর্বেই আমি সতেরটি সূরা মুখস্থ করেছিলাম।"[৪৬]

আওস ও খাযরাজ গোত্রে পূর্বে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই লেখাপড়া জানতেন; তবে রাফি ইবনে মালিক, যায়েদ ইবনে সাবিত, উবায় ইবনে কা'ব (রা.) প্রমুখ সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণের পর নাকী আল-খাদিমাতকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৪৭]

গামীম শিক্ষাকেন্দ্র

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পথে "গামীম" নামক স্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রিক ঘটনা সংঘটিত হয়। এখানে যাত্রাবিরতির সময় বুরাইদা ইবনে আল-হাসীব আল-আসলামী তাঁর কাছে এসে সাক্ষাৎ করেন। নবী (সা.) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, এবং তাঁর সঙ্গে থাকা প্রায় আশিটি পরিবারের লোকও ইসলাম গ্রহণ করে। সেই রাতে তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে 'ইশার সালাত আদায় করেন। এ যাত্রাপথেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বুরাইদাকে সূরা মারইয়ামের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ শিক্ষা দেন, যা প্রমাণ করে যে নবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্বই ছিল চলমান ও সর্বত্র বিস্তৃত এক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। পরবর্তীতে বদর ও উহুদের পর বুরাইদা (রা.) মদীনায় এসে সূরা মারইয়ামের বাকি অংশ শিখে নেন এবং দীর্ঘ সময় নবী (সা.)-এর সঙ্গেই অবস্থান করেন। গামীমে সংঘটিত এই শিক্ষা কার্যক্রম দেখায় যে, হিজরত–যদিও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক মিশন–তার মধ্যেও কুরআন শিক্ষা ও দাওয়াহের ধারাবাহিকতা কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অস্থায়ী বিরতিস্থলও পরিণত হয়েছিল এক সক্রিয় শিক্ষাকেন্দ্রে, যা ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে গেছে।[৪৮]

নবীজি (সা.)-এর হিজরতের পর মদীনায় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

হিজরতের পূর্বে মদীনায় তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেখানকার মসজিদসমূহের ইমামগণ তালিম দিতেন। হিজরতের পরেই মসজিদে নববী নির্মিত হয় এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় মাদরাসা। মদীনার ছোট-বড় সকল শিক্ষাকেন্দ্র এই কেন্দ্রীয় মাদরাসার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। সেই সাথে বিভিন্ন গোত্রে ক্বারী পাঠানো হয় যাঁরা কুরআন ও দীনের বিধি-বিধান বিষয়ে তালিম দিতেন। নবী (সা.)-এর আমলে মদীনার বাইরে মক্কা, তায়িফ, নাজরান, ইয়ামান, বাহরাইন, উমান প্রভৃতি অঞ্চল স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয় এবং তথাকার আমীর ও আমিলগণকে মু'আল্লিম ও মুকরীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৪৯]

মসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা

মদীনায় হিজরতের পূর্ববর্তী দুই বছর থেকেই বানূ যুরাইক, কুবা মসজিদ, নাকী আল-খাদিমাতসহ বিভিন্ন স্থানে কুরআন ও ইসলামী বিধি-বিধানের শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। এসব কেন্দ্রের শিক্ষকগণ "মু'আল্লিম" ও "মুকরী" হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষার্থী ইসলামি জ্ঞানে দক্ষ হয়ে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমনের পর এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে এক কেন্দ্রীয় কাঠামোর অধীনে সমন্বিত করে মসজিদে নববীতে একটি কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে "মজলিস" বা "হালকা" নামে পরিচিত হয়। নবী (সা.)-এর নিয়ম ছিল ফজরের সালাতের পর মসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে–আবু লুবাবা (রা.)-এর খুঁটির পাশে–বসে শিক্ষাদান করা। সেখানে আসহাবে সুফফা, স্থানীয় দরিদ্র মুসলিম, নতুন মুসলমান, সমাজের প্রান্তিক মানুষ এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিরা সমবেত হতেন। তিনি তাঁদেরকে কুরআন, হাদীস, শরীয়তের বিধি-বিধান, আখলাক ও সামাজিক নির্দেশনা শেখাতেন এবং সহমর্মিতা ও মানসিক সমর্থন প্রদান করতেন। আবু মুসা আল-আশআরি (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, ফজরের সালাতের পর সাহাবিরা নবী (সা.)-এর চারপাশে বসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন–কেউ কুরআন, কেউ ফারায়েজ, কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে। এর মাধ্যমে মসজিদে নববী একটি সর্বাঙ্গীন, সবার জন্য উন্মুক্ত এবং দৈনন্দিন শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়, যা ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচিত। মসজিদে নববীর এই কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা শুধু শিক্ষাদানের স্থানই ছিল না; বরং এটি ছিল ইসলামী সভ্যতার প্রথম "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়", যেখানে ধর্মীয় জ্ঞান, সামাজিক নৈতিকতা, প্রশাসনিক দিকনির্দেশনা এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের সমন্বিত শিক্ষা প্রদান করা হতো।[৫০]

আসহাবে সুফফা: প্রথম আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম প্রথম কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ, যার সঙ্গে সংযুক্ত এলাকায় একটি স্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়–যা ইতিহাসে মাদরাসা-ই-সুফফা নামে পরিচিত। মসজিদে নববীর পূর্ব আঙিনায় উঁচু একটি চত্বরের উপর ছাউনি স্থাপন করে যে প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছিল, সেটিই "সুফফা"। দিনের বেলা এটি ছিল শিক্ষাকেন্দ্র, আর রাতের বেলা দরিদ্র, আশ্রয়হীন ও নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের আবাসস্থল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।[৫১]

সুফফার ছাত্ররা দুই শ্রেণির ছিলেন–(১) সার্বক্ষণিক ছাত্র, (২) আশ্রয়হীন বা গৃহহীন ছাত্র। তাদের খাদ্য-আবাসনের ব্যয় বহন করা হতো রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ, আনসারদের দান ও শিক্ষাকেন্দ্রিক অনুদানের মাধ্যমে। আনসার সাহাবীরা ফসল কাটার মরসুমে এক কাঁদি খেজুর দান করতেন, যা সুফফায় ঝুলিয়ে রাখা হতো; পাকলে ছাত্ররা তা সংগ্রহ করে খেতেন। খেজুর পাহারার দায়িত্ব পালন করতেন মুআয ইবনে জাবাল (রা.)।[৫২] এ শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন, হাদীস, আকীদাহ, ইবাদত, ফিকহি বিধান, লেখাপড়া, এমনকি কর্মমুখী

শিক্ষারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল–ফরয ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অনুসন্ধানও ফরয, ফলে ছাত্রদের অনেকে অধ্যয়নের পাশাপাশি কাজও করতেন। যোগ্য ছাত্রদেরকে অন্যদের কুরআন শেখানোর দায়িত্বও দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও সুফফায় পাঠদান করতেন; বিশেষত ফজরের পরে বা উপযুক্ত সময়ে তিনি সেখানে এসে বসতেন এবং শিক্ষার্থীরা তাঁকে ঘিরে প্রশ্ন করতেন–কুরআন, ফারায়েজ, স্বপ্নের ব্যাখ্যাসহ নানা বিষয়ে। ব্যস্ত সাহাবীরাও সুযোগ পেলে সুফফার পাঠসভায় উপস্থিত হতেন।[৫৩] এক হাদীসে এসেছে নবী (সা.) বিদ্যাচর্চাকারী দলকে শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে অভিহিত করে তাঁদের সাথে যুক্ত হন।[৫৪] আসহাবে সুফফার বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন–আবু হুরায়রা (রা.), মুআয ইবনে জাবাল (রা.), আবু যর গিফারি (রা.) প্রমুখ। দূরবর্তী এলাকা থেকে ছাত্ররা সুফফায় এসে শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং শেষে নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে দ্বীনি শিক্ষা প্রচার করতেন। এইভাবে সুফফা ইসলামের কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র ও দাওয়াহ-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৫৫]

যুদ্ধবন্দীদের মাধ্যমে মদীনায় শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা

বদর যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী প্রায় সত্তর জন মুশরিককে বন্দী করে। এই বন্দীদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) মুক্তিপণ নির্ধারণ না করে একটি অনন্য শর্ত আরোপ করেন–প্রত্যেক বন্দী মুক্তির বিনিময়ে দশজন মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে। এই সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসে শিক্ষা বিস্তারের এক বৈপ্লবিক উদ্যোগ।[৫৬]

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামে জ্ঞান অর্জন সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন, এমনকি অমুসলিম শিক্ষকের কাছ থেকেও জ্ঞান গ্রহণ বৈধ ও প্রয়োজনীয়। নবী (সা.)-এর এই নীতি দেখায়–যেখানে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসার প্রশ্নে এসেছে, সেখানে ধর্ম, জাতি বা বর্ণ কোনো বাধা নয়; বরং সমাজের উন্নয়ন ও নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্য সব সম্ভাবনাকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পরিদর্শক

ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড প্রথমে শুধু মদীনাকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ থাকলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত তা বিস্তৃত হয়ে আঠারো থেকে উনিশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাষ্ট্রের ঃযরং ভূ-প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও চরিত্রগঠনের কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

এই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক ইয়েমেনের গভর্নর আমর ইবনে হায্ম (রা.)-কে পাঠানো বিশদ পত্র। এ পত্রে স্পষ্টভাবে নির্দেশ রয়েছে যে জনগণকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, দীনিয়াত, ইসলামী আচরণবিধি ও চারিত্রিক উন্নয়ন–এসব বিষয়ে সুসংগঠিতভাবে শিক্ষা দিতে হবে। এতে আরো উল্লেখ আছে যে গভর্নরদের দায়িত্ব শুধু প্রশাসনিক নয়; বরং সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করাও তাদের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য।[৫৭]

প্রত্যেক প্রদেশে গভর্নরদের পাশাপাশি স্থানীয় উলামা, ক্বারী, এবং মুকরীদের তত্ত্বাবধানে পাঠাগার, মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং জনসাধারণের জন্য নিয়মিত তালিমের ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে

দেখা যায়, নবী (সা.)-এর রাষ্ট্রে শিক্ষা ছিল একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় নীতি, যা সামাজিক স্থিতি, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং আদর্শ মানবিক সমাজ গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারী শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারী শিক্ষার ধরন বা চিত্রায়ণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

দ্বীন শিক্ষায় নারীদের আগ্রহঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়শা (রা) বলেছেন,

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّينِ

"আনসারী মহিলারা কতই না ভাল। দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরমও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।"[৫৮]

গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়নঃ ইসলামের শিক্ষা অর্জনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগের মহিলারা গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন। এ সম্পর্কে আয়েশা (রা.) বলেছেন,

كانت تنزل علينا الآية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها ولا نحفظها.

"নবী করীম (সা)-এর যুগে কুর'আন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্ত না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"[৫৯]

রাসূল (সা.) কর্তৃক সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবাহ উপস্থাপনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) জুম'আহর খুতবাহ এর মাধ্যমে নারীদের দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। এক্ষেত্রে যিনি সর্বশেষ কাতারে দাড়াতেন তিনিও রাসূল (সা.) এর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতেন। এ সম্পর্কে খাওলা বিন্‌তে কায়েস আল-জাহনিয়া (রা) নবী করীম (সা)-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেন,

كنت إسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا مؤخر النساء.

"জুম'আর দিনে আমি নবী (সা)-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[৬০]

অভিভাবকদের মাধ্যমে শিক্ষাদানঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষদেরকে প্রতিনিয়ত ইসলামি জীবনব্যবস্থার নানাদিক সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। এবং বলতেন, যা তাঁরা শিখেছেন তা যেন তাঁদের অধিভুক্ত নারীদের শিক্ষা দেন। নারীদের শিক্ষা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৬১] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী (রা.) বলেন, .علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم "তোমরা নিজেরা শিক্ষালাভ কর এবং পরিবারকেও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং আদব-কায়েদা শিক্ষা দাও।"[৬২]

মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা) বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী (স)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেন, ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[৬৩]

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ইসলামী সভ্যতার সূচনা ও বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুগান্তকারী। তাঁর প্রেরিত শিক্ষা-দর্শন কেবল ধর্মীয় জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা মানবিকতা, ন্যায়, নৈতিকতা, ব্যক্তি-গঠন, সমাজ-সংস্কার এবং বিশ্বশান্তির পূর্ণাঙ্গ ভিত রচনা করে। নবীজি (সা.) শিক্ষা কার্যক্রমকে এমন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়ায় রূপ দেন, যেখানে পুরুষ, নারী, শিশু, দাস, এমনকি যুদ্ধবন্দী পর্যন্ত জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত থাকেনি। শিক্ষাকে তিনি কেবল জ্ঞানার্জনের উপায় নয়, বরং আত্মিক উৎকর্ষ, চরিত্র উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। মক্কার প্রারম্ভিক গোপন শিক্ষাকেন্দ্রগুলো মুসলমানদের ঈমানি দৃঢ়তা ও তাওহিদের বোধকে শাণিত করে তোলে। আর মদীনায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা, আসহাবে সুফফার আবাসিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র ইসলামী জ্ঞানের বিস্তারকে সংগঠিত রূপ প্রদান করে। নবীজি (সা.)-এর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষা তদারকি, শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা পরিদর্শন ব্যবস্থার সূচনা ছিল এক অনন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ, যা পরবর্তী খিলাফত ও ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর শিক্ষা-সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাসভা ও দিকনির্দেশনা প্রদান সেই যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি ছিল, যা ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ভিত্তিক করে তোলে। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং সামাজিক কল্যাণের সমন্বয়ে গঠিত এক পূর্ণাঙ্গ মডেল–যা আজও মানবসমাজের জন্য দিকনির্দেশনামূলক। এই প্রবন্ধের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, নবীজীর (সা.) শিক্ষাদর্শন সকল যুগেই মানবতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পথনির্দেশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি:

[১]আল-কুরআন, সূরা আলে 'ইমরান, ৩ : ১৪৪। এ ছাড়া সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৪০; সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ২ ; সূরা আল-ফাত্হ, ৪৮ : ২৯।

[২]আল-কুরআন, সূরা আস-সফ্, ৬১ : ৬।

[৩]মুসলিম, হাজ্জাজ বিন মুসলিম, আস-সহীহ, (বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.), ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩৪, হাদীস নং-৪৩৪২; তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইবনু 'ঈসা, আস-সুনান (বৈরূত : দার ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, তা.বি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-২৭৬৬।

[৪]মাওলানা 'আশিক ইলাহী মীরঠী, ইসলাম (মীরঠ : মাতবা' দারুল কুতুব, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৩১।

[৫]বুখারী, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, আল-জামে' আস-সহীহ (বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ১৪০৭হি.),

১২ খণ্ড, পৃ. ২২২, ১৫ খণ্ড, পৃ. ৩৬; ইবনু সা'দ, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আল-মিসরীয়ী, আত-তাবাকাত

[৬]আল-কুবরা, (বৈরূত, ১৯৬০খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

[৭]ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৪), ১৪ তম খণ্ড, পৃ. ২২৩০।

[৮]ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ, পৃ. ১৬৮ ; শায়খ মুহাম্মদ খাদারী বিক, মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ,

(মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতুল কুবরা, ১৩৮২ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩ ; মুহাম্মদ আল-গাযালী, ফিকহুস সীরাত, (মিসর : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৫৫), পৃ. ৫০।

[৯]ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ, পৃ. ১৬৮ ; শায়খ মুহাম্মদ খাদারী বিক, মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ,

১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; মুহাম্মদ আল-গাযালী, ফিকহুস সীরাত (মিসরঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৫৫), পৃ. ৫০।

[১০]ইব্‌ন সা'আদ, আত-তাবাকাত আল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

ইব্‌ন সা'আদ, আত-তাবাকাত আল, ১ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৭; ইব্‌ন 'আব্দিল বার, আল-ইসতি'য়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২ ; বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, (কায়রো : মাতাবি' দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭ ; আয-যাহাভী, তারীখুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১ ; ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাত আল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫২ ; ইব্‌ন হাজার, তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

[১১]রাসূল (সা.)-এর বিবাহের সংখ্যার বিবরণঃ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্যে ভিত্তিতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের সংখ্যা ছিল ১১ জন। দ্র. নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪ ; এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২৮৭।

তবে তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এসেছে তিনি ২৫ জন মহিলাকে বিবাহ করেছেন এবং ২৫ জনকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় জানা যায়, তিনি ১৫ জন মহিলাকে বিবাহ করেছেন। ভিন্নমতে জানা যায়, তিনি ১৩ জন্য মহিরাকে বিবাহ করেন। দ্র. সা'ঈদ আইয়ুব, যাওযাতুন নাবিয়্যি, (বৈরূত : দারুল হাদী, ১৯৯৭), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭। এ সকল মতামতসমূহের মধ্যে বিজ্ঞ গবেষকগণ প্রথম মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

[১২]আন-নববী, তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪।

[১৩]ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫, হাদীস নং-৩ ; মুসলিম, আস-সহীহ, ১ খণ্ড, পৃ. ৩৮১, হাদীস নং-২৩১।

[১৪]আল-কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১; আল-কুর'আন, সূরা আন-নাজম, ৫৩ : ৮-১০।

[১৫]ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৭ ; ইব্‌ন হাজার, ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, প্‌ ২৩৬ ; যারকানী, শারহি

যারকানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮।

[১৬]মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী, সীরাতুল মুস্তফা সা., পৃ. ৪৬।

[১৭]ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং-১১৩০ ; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০, হাদীস

নং-৬৩৬ ; ইব্‌ন হাজার, ফতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

[১৮]ড. আ.ই. ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৩

[১৯]ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ইসলাম পরিচিতি (ওহঃৎড়ফঁপঃরড়হ ঃড় ওংষধস) (ভাষান্তরঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪১

[২০]মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (ভাষান্তরঃ মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, ঢাকাঃ ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ.৩।

[২১]মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষাব্যবস্থা', ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশের ত্রৈমাসিক জার্নাল (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানু-মার্চ ১৯৮৮ খ্রি.), ২৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৩১৬।

[২২]আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক, ৯৬:০১।

[২৩]ইবন মাজাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, সুনান ইবন মাজাহ (কায়রোঃ দারু ইহইয়াউ আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১, হাদিস নং-২২৪।

[২৪]মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭৪, হাদিস নং-২৬৯৯।

[২৫]এরনন, ঐ. অ. জ. গঁযধসসধফঃ অ ঐরংঃড়ৎরপধষ ঝঁৎাবু (ঙীভড়ৎফঃ ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু চৎবংং, ১৯৭০), ঢ়.৪৭, ৪৮.

[২৬]আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ০২:১২৯।

[২৭]আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ০২:১৫১।

[২৮]আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ, ৬১:০২।

[২৯]ড. মুহম্মদ আবদুল মাবুদ, রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৮১।

[৩০]মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-১৭।

[৩১]ড. মুহম্মদ আবদুল মাবুদ, রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৮২-১৮৪।

[৩২]ইবন হিশাম, আবদুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), ১ম

খণ্ড; পৃ. ২৩৪-২৩৬; আল-হালাবী, আলী ইবন বুরহান আদ-দীন, আস-সিরাহ আল-হালবিয়্যাহ (কায়রোঃ আল-মাতবা'আ আল-আমিরিয়্যাহ, ১৯৩২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; ইবন সা'আদ, মুহাম্মদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৬৮ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬।

[৩৩]আল-হালাবী, আলী ইবন বুরহান আদ-দীন, আস-সিরাহ আল-হালবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১।

[৩৪]আল-আযকারী, আবুল ওয়ালিদ, আখবারু মাক্কাহ্ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬।

[৩৫]ইবন হিশাম, আবদুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; লুৎফর রহমান ফারুকী, হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র (ঢাকাঃ মাসিক পৃথিবী, ১৯৯২ খ্রি.), ২৫-২৬।

[৩৬]ইবন হিশাম, আবদুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৪৪৫।

[৩৭]আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর, তারিখ আল-মুলুক ওয়ার রাসূল (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৬০ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

[৩৮]আল-ওয়াকেদী, মুহাম্মদ ইবন 'উমর, কিতাব আল-মাগাযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।

[৩৯]আল-আযকারী, আবুল ওয়ালিদ, আখবারু মাক্কাহ্, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০।

[৪০]ইবন হিশাম, আব্দুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ইবন সা'আদ, মুহাম্মদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৯।

[৪১]আল-হালাবী, আলী ইবন বুরহান আদ-দীন, আস-সিরাহ আল-হালবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২।

[৪২]আল-বালাযুরী, আহমদ ইবন ইয়াহইয়া, আনসাবুল আশরাফ (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; ইবন কাসীর, ইসমাঈল, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (রিয়াদঃ দারু 'আলিমুল কুতুব, ২০০৩ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯-১৬০; ইবনে হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০।

[৪৩]ইবন কাসীর, ইসমাঈল, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩; আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০-৩৫২; আল-ওয়াকিদী, মুহাম্মদ ইবন 'উমর, কিতাবুল মাগাযী (বৈরুতঃ দারু 'আলিমুল কুতুব, ১৯৮৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৯।

[৪৪]ইয়াকুত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান (বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৯৭৭ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

[৪৫]শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নাজামিয়্যাহ, ১৯৬৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

[৪৬]ইবন ইসহাক, মুহাম্মদ, আস-সিরাহ (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২।

[৪৭]ইবন হিশাম, আব্দুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪।

[৪৮]ইবন কাসীর, ইসমাঈল, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৩; ইবন হিশাম, আব্দুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৪।

[৪৯]ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

[৫০]মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান, জাম'উল ফাওয়ায়িদ (মিসরঃ মাতবা'আতু মিসর, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

[৫১]ইবন হিশাম, আব্দুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৬; মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত (সা.) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪১৭।

[৫২]ইবন সা'আদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০; ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

[৫৩]আয-যাহবী, শামসুদ্দিন, সীরু আলামিন নুবালা (বৈরুতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।

[৫৪]মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৫ খ্রি.), হাদিস নং-৬৭১, পৃ. ২৪৬।

[৫৫]শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, সাহাবা কাহিনী, ভাষান্তরঃ মোজাফ্‌ফর হোছাইন ও মোঃ মোছলেহুদ্দীন (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৮।

[৫৬]ইবন হিশাম, আব্দুল মালেক, আস-সিরাহ আন-নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩; আল-ওয়াকিদী, মুহাম্মদ ইবন 'উমর, কিতাবুল মাগাযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭।

[৫৭]ইবন আবদুল বার, ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ, আল-ইস্তিয়াবু ফী মা'আরিফাতিল আসহাব (বৈরুতঃ দারুল যায়িল, ১৯৯২ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৪।

[৫৮]আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিসাবুরী, সহীহ মুসলিম (বৈরূতঃ দারুল আফাকিল জাদীদ, তা.বি.), হাদিস নং-৭৭৬।

[৫৯]ইব্‌ন আবদি রাব্বিহি, আল-ইকদুল ফরীদ, ১ম খ. (কায়রোঃ মাতবা'আতুলাজনাতিত্‌ তা'লীক, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ.২৭৬।

[৬০]মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আবু ইবনে সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা (বৈরূতঃ দারু সাদির, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২১৭।

[৬১]আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরিম, আয়াতঃ ০৬।

[৬২]মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর (বৈরূতঃ দারু ইবনে কাসীর, ২০১০ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ.২৪৬।

[৬৩]আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৬০৫।